নব্য ফিতনা
"সালাফিয়্যা"

মূলঃ হোসাইন হিলমী ইশিক (রহঃ)
অনুবাদঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

নব্য ফিতনা
"সালাফিয়্যা"

মূলঃ
হোসাইন হিলমী ইশিক (রহঃ)

অনুবাদঃ
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

নব্য ফিতনা "সালাফিয়্যা"

মূল:হোসাইন হিলমী ইশিক (রহ:)
অনুবাদ:কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

This is a Bengali translation of the booklet "Salafiyya", which was written by Allama Husayn Hilmi Isik (Rahmatullahi alaih) of Turkey. Translation was done by Kazi Saifuddin Hossain, Dhaka, Bangladesh. It was first printed in Bengali in January 06, 1996. Allama Hilmi's wisal (reunion with Allah in the hereafter) was in the year 2001.

স্বত্ব : গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল:
প্রথম সংস্করণ : ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী
(পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দ:) উপলক্ষে)
৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান:
সানজরী পাবলিকেশন, আজিমপুর দায়রা শরীফ, ঢাকা
রেজভী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, শাহী মসজিদ, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদ, চট্টগ্রাম

মূদ্রণ:
জয়নাব প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজেস্
২০৩/২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৫৫৭৩৭, ০১৭১১-১৭৬৭২৩
email : joynabpress@gmail.com

বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল করীম

আম্মা বা'দ।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন, আহ্‌লে সুন্নাতের উলামায়ে কেরামগণের বইপত্রে 'সালাফিয়্যা' বা 'সালাফিয়্যা মযহাব' নামের কোনো কিছু উল্লেখিত হয় নি। এ সকল নাম, যা নাকি লা মযহাবীদের দ্বারা পরবর্তীকালে বানানো হয়েছে, তা ধর্মীয় পদে সমাসীন অজ্ঞ লোকদের দ্বারা লা মযহাবীদের আরবী বই-পত্র থেকে তুর্কী ভাষায় অনূদিত হওয়ার কারণে তুর্কীদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। তাদের মতেঃ

'সালাফিয়্যা' হচ্ছে সেই মযহাবের নাম যা আশআরিয়া ও মাতুরিদিয়া মযহাবগুলোর গোড়াপত্তনের আগে সকল সুন্নী মুসলিম কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। তাঁরা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনগণের অনুসারী ছিলেন। সালাফিয়্যা মযহাব হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের মযহাব। চারজন মহান ইমামই এ মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সালাফিয়্যা মযহাবের সমর্থনে লিখিত প্রথম পুস্তক হচ্ছে ইমামুল আযম হযরত আবু হানীফা (রাঃ)-এর 'ফিকাহ আল্ আকবর'। ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁর প্রণীত 'ইলজামুল আওয়াম আন্ ইলমিল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালাফিয়্যা মযহাবে সাতটি প্রয়োজনীয় নীতি ছিল। মুতা'খিরীন বা পরবর্তী উলামাগণের ইলমুল কালাম আরম্ভ হয়েছিল ইমাম গায্যালী (রহঃ) হতে। কালাম শাস্ত্রের পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামগণের মযহাবসমূহ এবং ইসলামী দার্শনিকগণের দর্শনসমূহ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করে ইমাম গায্যালী (রহঃ) ইলমুল কালামের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি তাঁদেরকে (পূর্ববর্তীদেরকে) খণ্ডন করার লক্ষ্যে ইলমুল কালামের মধ্যে দার্শনিক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত করেন।

আল রাযী ও আল আমিদী কালামশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রকে মিশ্রিত করে একটি জ্ঞানের শাখায় রূপান্তরিত করেন। আর আল্ বায়দাবী এ দুটোকে অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে ফেলেন। মুতা'খিরীনগণের ইলমুল কালাম সালাফিয়্যা মযহাবের প্রসার রোধ করে দেয়। ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর শিষ্য ইবনে আল কাইয়েম আল জাওযিয়া সালাফিয়্যা মযহাবকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেন-যা পরবর্তীতে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে; পূর্ববতী সালাফীগণ আল্লাহ্‌তা'লার সিফাত (গুণাবলী) কিংবা মুতাশাবিহ্ (দ্ব্যর্থবোধক) নাস্ বা কুরআন মজীদের আয়াত ও হাদীস ইত্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যাপৃত হন নি। কিন্তু পরবর্তী

সালাফিগণ তা নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে আল কাইয়েম আল জাওযিয়ার মত পরবর্তী সালাফীদের ক্ষেত্রে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সালাফীদেরকে সম্মিলিতভাবে 'আহল্ আস সুন্নত আল খাস্সা' বলা হয়ে থাকে। আহ্লে সুন্নতের কালাম শাস্ত্রের ব্যক্তিবর্গ কিছু নস্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু সালাফীগণ তার বিরোধিতা করেন। আল্লাহ্তায়ালার চেহারা ও তাঁর আগমন মানুষের চেহারা ও আগমন হতে ভিন্ন এই কথাটি বলে সালাফীয়্যাগণ মুশাববিহা সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন"। (লা মযহাবীদের বক্তব্য শেষ হলো)

আল আশআরী ও আল মাতুরিদী মযহাবগুলোর গোড়াপত্তন পরবর্তীকালে হয়েছে বলাটা সঠিক নয়। এ দুইজন মহান ইমাম (আল আশআরী ও আল মাতুরিদী) সালফ-এ সালেহীনগণ কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত ই'তিক্বাদ ও ঈমানের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করে এবং শ্রেণীবিভক্ত করে প্রকাশ করেছিলেন, যাতে করে যুব সম্প্রদায় তা সহজে বুঝতে পারেন। ইমাম আল্ আশআরী ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যদের শৃংখলভুক্ত ছিলেন। আর ইমাম মাতুরিদী ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর শিষ্যদের শৃংখলের অন্তর্ভুক্ত। আল্ আশআরী ও আল্ মাতুরিদী কখনোই তাঁদের ইমামের সার্বিক মযহাবের বাইরে যান নি। তাঁরা নতুন কোনো মযহাবের গোড়াপত্তন করেন নি। এই দুইজন এবং তাঁদের শিক্ষকগণ এবং চার মযহাবের ইমামগণ সবাই একটি সার্বিক (Common) মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিশ্বাস (আকিদা) সংক্রান্ত এই মযহাবটি আহ্লুস্ সুন্নাতি ওয়াল জামাত নামেই সুপরিচিত। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বিশ্বাস হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণের বিশ্বাস। ইমামুল আযম হযরত আবু হানীফা (রহ:) কর্তৃক লিখিত 'ফিকাহ্ আল আকবর' পুস্তকটি আহ্লে সুন্নতের মযহাবটিকে সমর্থন করে। 'সালাফিয়্যা' শব্দটি সেই পুস্তকে কিংবা ইমাম গাযযালী (রহ:)-এর ইলজামুল আওয়াম আন্ ইলমিল কালাম' গ্রন্থটিতে অস্তিত্বহীন। 'ফিকাহে আকবর' গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'কওলুল ফসল' আহ্লে সুন্নতের মযহাবটি শিক্ষা দেয় এবং বাতিলপন্থী সম্প্রদায় ও দার্শনিকদের জবাব দেয়। ইমাম গাযযালী (রহ:) তাঁর "ইলজামুল আওয়াম" গ্রন্থে লিখেছেন, "এ বইটিতে আমি দেখাব যে সালাফগণের মযহাবটি সত্য এবং সঠিক। আমি আরো ব্যাখ্যা করবো যে, যারা এ মযহাবটি হতে বিচ্যুত হয় তারা বিদ'আতী! সালাফগণের মযহাব হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীনগণের অনুসৃত মযহাব। এ মযহাবটির প্রয়োজনীয় নীতি হলো সাতটি।" অতএব পরিস্ফুট হলো যে, "ইলজাম" পুস্তকটি "সালাফগণের"

মযহাবের সাতটি মূলনীতি সম্পর্কে লিখেছে। কিন্তু এগুলোকে 'সালাফিয়্যাদের' প্রয়োজনীয় নীতি বলাটা হলো বইটির ভাষ্যকে বিকৃত করা এবং ইমাম গাযযালী (রহঃ) -এর কুৎসা রটনা করা। আহ্‌লে সুন্নাতের অন্যান্য পুস্তকের মতই মহামূল্যবান ফিকাহ গ্রন্থ 'দুর্‌রুল মুখতার-এর 'সাক্ষ্য' অধ্যায়ে 'সালাফ' ও খালাফ' শব্দগুলোর পরে লেখা আছেঃ

كلمة السلف اسم الصحابة والتابعين ويقال لهم السلف الصالحون والخلف يقال لعلماء اهل سنة الذين أتو بعد السلف الصالحين.

অর্থ- 'সালাফ' শব্দটি হলো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীনগণের নাম। তাঁদেরকে 'সলফে সালেহীন' হিসেবেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। আর আহ্‌লে সুন্নতের সেই সকল উলামা যাঁরা সলফে সালেহীনের পরে এসেছেন তাঁদেরকে বলা হয় "খালাফ"। তাবে তাবেয়ীনগণও সলফে সালেহীনের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আল গাযযালী (রহঃ), ইমাম আল রাযী (রহঃ) ও ইমাম আল বায়দাবী (রহঃ) যাঁদেরকে মুফাস্‌সিরিনে কেরাম বা কুরআন মজীদ ব্যাখ্যাকারীগণ সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন, তাঁরাও সলফে সালেহীনের মযহাবের অন্তর্গত ছিলেন।

উপরোক্ত বুযূর্গবৃন্দের সময় আবির্ভূত বিদআতী সম্প্রদায়গুলো ইলমুল কালামকে দর্শনের সাথে মিশ্রিত করে। বস্তুতঃ দর্শনের ওপরই তারা তাদের ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে। "আল মিলাল ওয়ান নিহাল" পুস্তকটি ওই সকল গোমরাহ্‌ (পথভ্রষ্ট) দলগুলোর বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে। ওই সকল গোমরাহ্‌ দলের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করে আহ্‌লে সুন্নতের মযহাবটিকে সমর্থন করতে যেয়ে এই তিনজন মহান ইমাম তাদের ভ্রান্ত দর্শনের প্রতি বিস্তারিত জওয়াব দিয়েছিলেন। ওই সকল জওয়াব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা আহ্‌লে সুন্নতের মযহাবের সাথে দর্শনকে মিশ্রিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা কালাম শাস্ত্রকে ওরই মধ্যে সন্নিবেশিত দার্শনিক ধ্যান ধারণা থেকে পরিশুদ্ধ করেন। আল বায়দাবীর তাফসীরগ্রন্থ কিংবা সেটার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থ শায়খজাদার তাফসীরের কোনোটাতেই দার্শনিক ধ্যান ধারণা অথবা দার্শনিক পদ্ধতি নেই। এ সকল মহান ইমাম দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন বলাটা জঘন্য কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছু নয়। ইবনে তাইমিয়াই সর্বপ্রথমে তার "আল ওয়াসিতা" নামক পুস্তকে সুন্নী জামাতের উলামাদের প্রতি এই অপবাদটি প্রদান করে। উপরন্তু, ইবনে তাইমিয়া ও তার শিষ্য ইবনে কাইয়েম আল্‌ জাওযিয়া সালাফিয়্যা মযহাবকে

সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিল বলাটা আসলে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মতপার্থক্যের কেন্দ্র বিন্দুতে আরেকটি ভাওতা যোগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দুই ব্যক্তির আগে "সালাফিয়্যা" নামের কোনো মযহাবই ছিল না, এমন কি "সালাফিয়্যা" শব্দটিও ছিল না; তাহলে কীভাবে দাবি করা যায় যে তারা এটাকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল? ওই দুই জনের আগে কেবলমাত্র একটি সঠিক মযহাব ছিল-সলফে সালেহীনের সঠিক মাযহাব, যার নাম আহ্‌ল আস্ সুন্নত ওয়াল জামাত। ইবনে তাইমিয়াই এই সঠিক মাযহাবটিকে বিকৃত করতে চেষ্টা করেছিল এবং বহু বিদআতের আবিষ্কার করেছিল। বর্তমানকালের লা-মাযহাবী লোকদের বিকৃত ও গোমরাহ চিন্তাধারা, বক্তব্য এবং বইপত্রের উৎস হচ্ছে ইবনে তাইমিয়ার আবিস্কৃত বিদআতসমূহ। মুসলিমদেরকে ধোকা দেবার জন্যে এবং যুব সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করবার জন্যে এ সকল গোমরাহ ব্যক্তি এখন একটি অত্যন্ত ধূর্ত চাল চেলেছে। তারা "সলফে সালেহীন" শব্দটি থেকে "সালাফিয়্যা" শব্দটি বানিয়ে নিয়েছে, যাতে করে তারা ইবনে তাইমিয়ার বিদআত ও ভ্রষ্ট ধ্যান ধারণাকে সঠিক প্রতিপন্ন করতে পারে এবং যুব সমাজকে তারা গোমরাহীতে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তারা সালাফ-ই-সালেহীনদের উত্তরসূরী ইসলামী উলামাদের প্রতি বিদআত ও দর্শনের অপবাদ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং তাঁদেরকে তাদেরই আবিস্কৃত "সালাফিয়্যা" নামটির বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে দোষারোপ করেছে। তারা ইবনে তাইমিয়াকে একজন মুজতাহিদ হিসেবে পেশ করে, যে নাকি "সালাফিয়া"কে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সালাফ-ই সালেহীনের উত্তরসূরী আহ্‌লে সুন্নতের উলামাবৃন্দই সলফে সালেহীনের মযহাব আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের এ'তেকাদ সংক্রান্ত শিক্ষাসমূহ নিষ্কলুষ রাখতে তৎপর ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তাঁরা যা লিখেছেন এবং লিখছেন তাতে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন এবং জানাচ্ছেন যে ইবনে তাইমিয়া, শওকানী এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গই সালফে সালেহীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তারাই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করছে ও জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাচেছ। যাঁরা "আত তাওয়াসসুলু বিন্ নবী ওয়া জাহলাতুল ওয়াহহাবীয়িন", "উলামাউল ইসলাম ওয়াল ওয়াহহাবীঈন", "শিফাউস সিকাম" এবং তার মুখবন্ধ "তাতহিরুল ফুয়াদ মিন দানিসিল এ'তেকাদ" পড়েছেন, তাঁরা স্পষ্টই বুঝতে পারবেন, যে সকল লোক 'নতুন সালাফিয়্যা' (السلفية الجديدة) নামক মহাভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ আবিষ্কার করে নিয়েছে, তারা আসলে মুসলিমদেরকে ভেতর থেকে ধ্বংস করছে।

আজকাল কিছু মুখ খুব ঘন ঘন 'সালাফিয়্যা' নামটি উচ্চারণ করে থাকে। অথচ প্রত্যেক মুসলমানেরই এটা ভাল করে জানা উচিৎ যে, "সালাফিয়্যা মযহাব" নামে ইসলামে কোনো কিছু নেই; বরং হাদীস শরীফে প্রশংসিত প্রথম দুই ইসলামী শতাব্দীর মুসলমান তথা সালফ-ই-সালেহীনগণের একটি মযহাবই আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আগমনকারী ইসলামী উলামাকে বলা হয় "খালাফ আস সোয়াদেকীন"। এ সকল সম্মানিত জ্ঞান বিশারদদের এ'তেকাদ বা বিশ্বাসসমূহকেই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাতের মতাদর্শ বলে। এটা হচ্ছে ঈমানের মযহাব। আসহাবে কেরাম ও তাবেয়ীনগণেরও এই একই ঈমান ছিল। তাঁদের ঈমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। বর্তমানকালে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিমই আহ্‌লে সুন্নতের আদর্শে বিশ্বাসী। ইসলামী দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে বাহাত্তরটি মহাভ্রান্ত বিদআতী দলের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে; তাদের মধ্যে কয়েকটি দলের স্থপতিরা পূর্বেই আগমন করেছিল, কিন্তু তাবেয়ীনগণের পরেই তাদের বইপত্র প্রকাশ পায় এবং তারা দলে দলে আবির্ভূত হয়ে আহ্‌লে সুন্নাতকে আক্রমণ করতে শুরু করে।

রাসুলুল্লাহ (দঃ)-ই আহ্‌লে সুন্নাতের বিশ্বাসসমূহ নিয়ে এসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরামগণ ঈমান সংক্রান্ত এ সকল শিক্ষা উৎস থেকে গ্রহণ করেছিলেন। আর তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনগণ ক্রমানুসারে এগুলো তাদের থেকে গ্রহণ করে নেন। এরপর তাঁদের উত্তরসূরীগণ এগুলো শিক্ষা করেন; ফলশ্রুতিতে এই শিক্ষাসমূহ আমাদের কাছে 'তাওয়াতুর' ও বর্ণনার মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে। এ শিক্ষাগুলো যুক্তি বা বিশ্লেষণ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। মস্তিষ্ক এগুলোকে পরিবর্তিত করতে পারে না, বরং উপলব্ধি করতে সহায়তা করতে পারে। অর্থাৎ এগুলোকে বুঝতে হলে মস্তিষ্কের প্রয়োজন আছে; এগুলো যে সঠিক এবং মূল্যবান তা জানবার ও বুঝবার জন্যে মস্তিষ্ক প্রয়োজনীয়। সকল হাদীসের উলামাই আহ্‌লে সুন্নতের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আমল সংক্রান্ত চারটি মযহাবের (যথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী) ইমামগণও এ আদর্শে বিশ্বাস করতেন। আর বিশ্বাস সংক্রান্ত আমাদের মযহাবটির দুইজন ইমাম হযরত মাতুরিদী এবং হযরত আশআরী উভয়ই এই মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উভয় ইমামই এই মযহাবটি প্রচার করেছিলেন। তাঁরা সব সময়ই গোমরাহ ব্যক্তিবর্গ এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শনের চোরাবালিতে আটকে পড়া বস্তুবাদীদের বিরুদ্ধে এই মযহাবের পক্ষাবলম্বন করে এটাকে সমর্থন যুগিয়েছেন। যদিও তাঁরা সমসাময়িককালের ছিলেন, তবুও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী হওয়ার কারণে এবং তাঁদের

মোকাবিলাকৃত বিরুদ্ধবাদীদের চিন্তা চেতনা ভিন্ন হওয়ার দরুন তাঁদের জওয়াব দেবার পদ্ধতিও পৃথক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মযহাবের অন্তর্গত ছিলেন। এই দুই জন মহান ইমামের পরবর্তীকালে আগত শত সহস্র উচ্চ শিক্ষিত উলামা ও আউলিয়া তাঁদের বইপত্র অধ্যয়ন করে সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা আহ্‌লে সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। সুন্নী উলামাগণ নাস্ সমূহের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজন ব্যতিরেকে সেগুলোকে তাবিল তথা ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা পরবর্তিত করেন নি। আর তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান ধারণা মাফিক কোনো পরিবর্তনও করেন নি। কিন্তু যারা গোমরাহ ও লা-মযহাবী দলগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা ইসলামের দুষমন গ্রীক দার্শনিক ও ভণ্ড বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষানুযায়ী ঈমান ও এবাদতের শিক্ষাসমূহের পরিবর্তন সাধন করতে কালবিলম্ব করে নি।

যখন আহ্‌লে সুন্নতের উলামাদের খেদমতগার ও ইসলামের ধারক বাহক উসমানীয়দের পতন ঘটলো-যা সম্ভব হয়েছিল সর্বশক্তি নিয়োগকারী বৃটিশদের শয়তানী চাল ও মিশনারী এবং ম্যাসন (অন্তর্ঘাতী মুনাফিক-দের) নিরলস অপতৎপরতা দ্বারা, তখন লা-মযহাবীরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। চালবাজী ও ঘৃণ্য পন্থায় তারা আহ্‌লে সুন্নাহ্‌কে আক্রমণ শুরু করে দিল এবং ইসলামকে ভেতর থেকে ধ্বংস করতে লাগলো। এটা ঘটতে থাকলো সেই সব দেশে যেখানে সুন্নী উলামাদের কোনো বাক্ স্বাধীনতা নেই (উদাহরণস্বরূপ- সউদী আরব)। সউদী ওহাবীদের হাতে ব্যয়কৃত কোটি কোটি প্রেট্রো ডলার এ আক্রমণকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে। পাক-ভারত ও আফ্রিকী দেশগুলো হতে প্রাপ্ত খবরে বোঝা যাচ্ছে যে, ইসলমী জ্ঞানে অজ্ঞ ও খোদা ভীতিহীন কিছু লোককে তাদের দালালির জন্যে এ সকল আক্রমণকারীরা উচ্চপদ ও ভরণ পোষণ দান করছে। বিশেষ করে যুব সমাজকে ধোকা দিয়ে সুন্নী পথ হতে দূরে সরিয়ে নেয়ার জন্যেই তাদেরকে এ সকল ঘৃণিত সুবিধাদি দেয়া হচ্ছে।

গোমরাহ ওহাবীদের দ্বারা মাদ্রাসার ছাত্রদের এবং মুসলিম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্যে লিখিত বইসমূহের একটিতে লেখা হয়েছে : "আমি মযহাবসমূহের একগুঁয়েমি দূর করতে এবং সবাইকে শান্তিতে নিজ নিজ মযহাবে জীবন ধারণ করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এ পুস্তকখানি প্রণয়ন করেছি"। এ লোকটি বোঝাতে চাচ্ছে যে, মযহাবসমূহের 'একগুঁয়েমির' সমাধান আহ্‌লে সুন্নাতকে আক্রমণ ও সুন্নী উলামায়ে কেরামকে হেয়করণের

মধ্যেই নিহিত। সে ইসলামের বুকে ছুরিকাঘাত করছে এবং তারপরে বলছে যে, সে এটা মুসলমানদের শান্তিতে বসবাসের জন্যেই করছে! পুস্তকটির অন্যত্র লেখা আছে, "যদি কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁর চিন্তায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, তবে তাঁকে দশটি পুরস্কার দেয়া হবে। যদি তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি একটি পুরস্কার পাবেন"। এ কথা অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি-হোক সে খ্রীষ্টান কিংবা মুশরিক মূর্তি পূজারী-তার প্রতিটি চিন্তার জন্যে পুরস্কৃত হবে! দেখুন কীভাবে এ লোকটি আমাদের রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পবিত্র হাদীস শরীফকে বিকৃত করছে এবং কীভাবে সে চালবাজী করছে! হাদীস্ শরীফটি এরশাদ ফরমায় ان أصبت فلک عشر حسنات وان اخطات فلک حسنة.

অর্থ- যদি কোনো মুজতাহিদ কোনো আয়াতে করীমা কিংবা হাদীস শরীফ হতে আইন কানুন বের করতে যেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, তবে তাঁর জন্যে দশটি সওয়াব থাকবে। আর যদি তিনি তাঁর ইজতিহাদে ভুল করেন, তাহলে তাঁকে একটি সওয়াব দেয়া হবে (আল হাদিস)। হাদিস শরীফটি পরিস্ফুট করে এ সকল সওয়াব যে কোনো চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে না, বরং ইজতেহাদের মর্যাদা লাভকারী একজন ইসলামী জ্ঞান বিশারদকেই প্রদান করা হবে; তাঁর প্রতিটি চিন্তার জন্যে এগুলো প্রদান করা হবে না, বরং 'নস' বা শরীয়তের দলিল হতে তাঁর আইন কানুন বের করার জন্যেই তাঁকে এগুলো দেয়া হবে। কেননা, তাঁর এ কাজটি একটি এবাদত। অন্য যে কোনো এবাদতের মতো এটাকেও সওয়াব দেয়া হবে।

সালাফ-এ সালেহীন ও তাঁদের উত্তরসূরী মুজতাহিদ ইমামগণের যমানায়, অর্থাৎ ইসলামী চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যখনি জীবনধারা ও জীবন মান পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে কোনো নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটত, তখনি মুজতাহিদ ইমামগণ রাত দিন পরিশ্রম করে 'আল আদিল্লাত আশ শরীয়ত'-এর চারটি উৎস হতে সেই বিষয়টি কীভাবে পালন করা হবে তার ফয়সালা বের করতেন। আর সকল মুসলমান তাঁদের নিজ নিজ মযহাবের ইমামের প্রদত্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী তা পালনও করতেন এবং যাঁরা পালন করতেন তাঁদেরকে দশটি কিংবা একটি সওয়াব প্রদান করা হতো! ইসলামী চতুর্থ শতাব্দীর পর মানুষেরা ওই সকল মুজতাহিদের সিদ্ধান্তগুলোই অনুসরণ করতে থাকেন। এ দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় কোনো মুসলমানই আমল করার ব্যাপারে কোনো সমস্যায় পেরেশানগ্রস্ত হন নি। ইত্যবসরে কোনো আলেম বা মুফতীকে এমন কি ইজতেহাদের সপ্তম সারিতে পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা হয়

নি। ফলে আমাদেরকে আজকাল এমন একজন মুসলমানের কাছ থেকে তা শিক্ষা করতে হয় যিনি চার মযহাবের কোনো একটি মযহাবের ইমামগণের বইপত্র পাঠ করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন এবং যিনি সেগুলো অনুবাদও করতে পারেন; আমাদেরকে সেগুলো অনুযায়ী আমাদের প্রাত্যহিক জীবন যাপন ও এবাদত বন্দেগী সম্পন্ন করতে হবে।

আল্লাহ তা'লা তাঁর কুরআনুল করীমে প্রত্যেক বস্তুর আইন কানুন ঘোষণা করেছেন। তাঁর মহান রাসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলোর সবই ব্যাখ্যা করেছেন। আর আহ্‌লে সুন্নাতের উলামাগণ সেগুলো সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সকল পুস্তক বর্তমানে সারা বিশ্বে বিরাজ করেছে। কেয়ামত পর্যন্ত যে কোনো স্থানে উদ্ভূত যে কোনো বিষয়ের সাথে এ সকল পুস্তকের কোনো একটি শিক্ষার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যাবেই। এ সম্ভাবনাটি হলো কুরআনুল করীমের একটি মু'জিযা এবং ইসলামী জ্ঞান বিশারদদের একটি কারামত। কিন্তু একজন প্রকৃত সুন্নী মুসলমানের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে শেখাটা এ ক্ষেত্রে একান্ত জরুরি। যদি আপনারা একজন লা-মযহাবী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে সে আপনাদেরকে ফেকাহ গ্রন্থের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ জবাব দিয়ে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি কীভাবে যুব সম্প্রদায় সে সমস্ত লা-মযহাবী মূর্খ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে- যারা কিছু বছর আরব দেশগুলোতে অবস্থান করে আরবী শিক্ষা লাভ করে এবং সেখানে আমোদ ফূর্তিতে সময় অতিবাহিত করার পর আহ্‌লে সুন্নতের একজন শত্রু লা-মযহাবী গোমরাহ ব্যক্তির সইকৃত সনদপত্র সংগ্রহ করে ভারত কিংবা পাকিস্তানে (বাংলাদেশেও) ফিরে যায়। যুবকেরা তাদের নকল সনদপত্র দেখে এবং আরবী কথাবার্তা শুনে মনে করে যে, সত্যি সত্যি বুঝি তারা ইসলামী উলামা! অথচ তারা ফেকাহর একটি গ্রন্থও বুঝতে সক্ষম নয়। আর তারা ফেকাহ্ গ্রন্থের শিক্ষাসমূহ সম্পর্কেও অজ্ঞ। বস্তুতঃ তারা এ সকল ধর্মীয় শিক্ষায় বিশ্বাসই করে না; বরং তারা এগুলোকে কুসংস্কার ও একগুঁয়েমি আখ্যায়িত করে থাকে। পূর্ববর্তী যমানায় ইসলামী উলামাগণ তাঁদের প্রতি করা প্রশ্নসমূহের উত্তর ফেকাহর গ্রন্থাবলীতে খুঁজে দেখতেন এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত উত্তর প্রশ্নকারীকে প্রদান করতেন। কিন্তু লা-মযহাবী একজন ধর্মীয় ব্যক্তি ফেকাহর গ্রন্থাবলী পড়তে ও বুঝতে অক্ষম হয়ে নিজের মূর্খতা ও ত্রুটিপূর্ণ মস্তিষ্কে যা কিছু আসবে তাই প্রশ্নকারীদেরকে জবাব দিয়ে তাদেরকে গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) ও জাহান্নামী

বানাবে। এ কারণেই আমাদের রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন-

الا ان الشر الشر شرار العلماء وان خير الخير خيار العلماء۔

অর্থাৎ- "(সৃষ্টিতে) খারাপের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো (বদকার, বদ আকিদাসম্পন্ন) আলেম। আর ভালোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো আলেমে (হক্কানী রব্বানী, বুযুর্গানে দ্বীন)" (আল হাদীস)। হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে, আহ্‌লে সুন্নতের বিজ্ঞ আলেমগণ হলেন সৃষ্টির সেরা; আর লা-মযহাবীরা হলো সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। কেননা সুন্নী উলামাগণ মানুষদেরকে রাসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন, ফলশ্রুতিতে জান্নাতে দাখিল হতে সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে, লা-মযহাবীরা নিজেদের গোমরাহ ধ্যানধারণার দিকে মানুষদেরকে প্ররোচনা দিয়ে তাকে এবং ফলস্বরূপ তাদেরকে জাহান্নামের বাসিন্দা বানিয়ে দেয়।

জামে' আল-আজহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক স্নাতক ডিগ্রিধারী উস্তাদ ইবনে খলীফা আলাউয়ী তাঁর কৃত "আকিদাতুস সালাফী ওয়াল খালাফ" গ্রন্থে আল্লামা আবু জুহরা রচিত তারিক আল মযাহিবিল ইসলামিয়া গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, কিছু লোক যারা হাম্বলী মযহাবের সাথে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল, তারা নিজেদেরকে সালাফ্যিয়ীন আখ্যায়িত করেছিল। আবুল ফারাজ ইবনে আল জাওযী এবং অন্যান্য হাম্বলী মযহাবের উলামাগণ সেই সব সালাফীকে সালাফ আস সালেহীনের অনুসারী নয় বরং মুজাস্‌সিমা সম্প্রদায়ের বিদআতী হিসেবে ঘোষণা করে তাদের ফিতনাকে দমন করেন। সপ্তম শতাব্দীতে ইবনে তাইমিয়া পুনরায় এই ফিতনা জাগ্রত করে"।

(আকিদাতুস সালাফ ১ম প্রকাশ দামেশক ১৯৭৮ ইং)

লা-মযহাবীরা "সালাফিয়্যা" নামটি গ্রহণ করেছে এবং ইবনে তাইমিয়াকে 'সালাফিগণের মহান ইমাম' বলে দাবি করছে। এই শব্দটি একটি ক্ষেত্রে সত্য এ কারণে যে, তার আগে সালাফী শব্দটির অস্তিত্বই ছিল না। ইবনে তাইমিয়ার আগে কেবলমাত্র সালাফ আস সালেহীনগণের অস্তিত্ব ছিল, যাঁদের মযহাব (পথ) ছিল আহ্‌ল আস্ সুন্নাহ। ইবনে তাইমিয়ার গোমরাহ ধ্যান-ধারণাই ওহাবী, মওদূদী ও লা-মযহাবী ব্যক্তিবর্গের জন্যে উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইবনে তাইমিয়া পূর্বে হাম্বলী মযহাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল; অর্থাৎ সে পূর্বে সুন্নী ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সমর্থ হলো এবং ফতোয়া প্রদানের ডিগ্রী অর্জন করলো, তখনি সে অহংকারী হয়ে উঠলো এবং আহ্‌লে সুন্নতের উলামাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে যাহের করতে শুরু করে দিল। তার জ্ঞান বৃদ্ধিই তার গোমরাহীর সূচনা করল। অতঃপর সে আর

হাম্বলী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা, চার মযহাবের অন্তর্গত হতে হলে সুন্নী বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। আহ্‌লে সুন্নতের আকিদা বিশ্বাস বর্জিত কোনো ব্যক্তিকে হাম্বলী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না।

লা-মযহাবী ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজেদের দেশে ধর্মীয় কর্তব্য পালনরত সুন্নী ব্যক্তিগণের প্রতি কালিমা লেপনের এবং হেয় প্রতিপন্নকরণের সুযোগ সন্ধান প্রতিনিয়তই করে থাকে। তারা সুন্নীদের বইপত্র পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং আহ্‌লে সুন্নতের শিক্ষাসমূহ বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এই ফকিরের নাম (হুসাইন হিলমী ইশিক) উল্লেখ করে জনৈক লা-মযহাবী ব্যক্তি বলেছে, "ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে একজন রসায়নবিদ বা ওষুধ বিজ্ঞানীর কাজ কী? তার উচিৎ তার নিজের জ্ঞানের শাখায় কাজ করে যাওয়া এবং আমাদের কাজে নাক না গলানো"। কী চরম অজ্ঞতাপ্রসূত ও আহমকীপূর্ণ ধারণা! সে ধরে নিয়েছে যে, একজন বিজ্ঞানীর কোনো ধর্মীয় জ্ঞান থাকতেই পারে না। অথচ সে এই সত্যটি সম্পর্কে অনবগত যে, মুসলমান বিজ্ঞানীগণ খোদাতা'লার সৃষ্টিসমূহকে প্রতিটি মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সৃষ্টির কেতাবে প্রদর্শিত সৃষ্টার ত্রুটিবিহীন গুণাবলী উপলব্ধি করেন; আর খোদাতা'লার অসীম ক্ষমতার তুলনায় সৃষ্টিসমূহের অক্ষমতা দর্শন করে তাঁরা প্রতিনিয়ত অনুধাবন করেন যে, আল্লাহপাক অন্যান্য কোনো কিছুরই মত নন এবং তিনি সকল ত্রুটিবিচ্যুতিরই উর্ধ্বে। বিখ্যাত জার্মান পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংক তাঁর 'ডারষ্ট্রম' পুস্তকে এটা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ লা-মযহাবী অজ্ঞ লোকটি তারই মত কোনো গোমরাহ ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রামাণ্য দলিল ও গদির ওপর নির্ভর করে এবং সম্ভবতঃ সউদী আরব হতে সরবরাহকৃত স্বর্ণের মোহাচ্ছন্ন হয়ে ভাবছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান বুঝি তারই একচেটিয়া কারবার।

হাঁ, আমি (হোসাইন হিলমী ইশিক) ত্রিশ বছর যাবত রসায়ন-কৌশল ও ওষুধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে আমার দেশের খেদমত করে এসেছি। কিন্তু একই সাথে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সাত বছর ধরে দিন-রাত পরিশ্রম করে আমি একজন মহান ইসলামী আলেমের দেয়া এজাযত দ্বারা ধন্য হই। ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশালতার মাঝে আমি নিজের অক্ষমতা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। এই উপলব্ধির কারণে আমি প্রকৃত অর্থেই একজন বান্দা হবার চেষ্টা করেছি। আমার সব চেয়ে বড় ভয় ও দুশ্চিন্তা আমার সনদ এবং এজাযতের মোহে না পড়ে যাই এবং নিজেকে

এসব বিষয়ে 'সবজান্তা' না ভেবে বসি। আমার ভীতির নিদর্শন আমার সকল পুস্তকেই বিরাজমান। আমার কোনো বইতেই আমি আমার ধ্যান-ধারণা কিংবা অভিমত উপস্থাপন করার সাহস প্রদর্শন করিনি। আমি আমার ছোট ভাইদের কাছে সব সময়ই আহ্‌লে সুন্নতের আলেমগণের মহামূল্যবান লেখনীসমূহ আরবী ও ফারসী হতে অনুধাবন করে উপহার দিতে চেষ্টা করেছি- যে সমস্ত লেখনী সমঝদারগণ শ্রদ্ধা করেন। আমার এ ভয়ের কারণে বহু বছর আমি বইপত্র লেখার সাহসই করিনি।

اذا ظهرت الفتن اوقال البدع وسب اصحابى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذالک فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين۔

"যখন ফিতনা প্রকাশ হবে কিংবা আমার সাহাবীদেরকে বিদআতী ব্যক্তিবর্গ সমালোচনা করবে তখন যেন জ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সত্য প্রকাশ করে। যদি সে এ রকম কাজ না করে, তবে তার ওপর আল্লাহ তা'লা, ফেরেশতাকুল ও মনুষ্যজাতির লা'নত তথা অভিসম্পাত! আল্লাহ পাক তার কোনো কাজ কিংবা ন্যায়-নিষ্ঠাই আর কবুল করবেন না"। এই হাদীসটি দেখার পর আমি গভীর চিন্তা শুরু করলাম। একদিকে আহ্‌লে সুন্নতের জ্ঞান বিশারদগণের ধর্মতত্ত্ব ও তাঁদের সময়কার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিষয়ক উপলব্ধি ও মানসিক পরিপক্কতা সম্পর্কে এবং তাঁদের এবাদত ও তাকওয়া সম্পর্কে জানতে পেরে আমি আমার ক্ষুদ্রতা দেখতে পাই, অপর দিকে ক্রম হ্রাসমান পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে আহ্‌লে সুন্নতের উলামাগণের বইপত্র পড়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম দেখে এবং অজ্ঞ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সেজে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর গোমরাহ পুস্তকাদি রচনা করতে দেখে আমি দুঃখ ভারাক্রান্ত হই। হাদীসে বর্ণিত শাস্তি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। আমার প্রিয় ছোট ভাইদের জন্যে আমার অনুভূত দয়া ও সহানুভূতিও আমাকে তাদের খেদমতে আসতে বাধ্য করে, যার দরুন আমি আহ্‌লে সুন্নতের উলামাগণের বইপত্র হতে অনুবাদ ও প্রকাশনা আরম্ভ করি। অসংখ্য অভিনন্দনসূচক চিঠি যা আমি পেয়েছি, তার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে আমি লা-মযহাবীদের পক্ষ থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও কঠোর সমালোচনাও শ্রবণ করেছি। কিন্তু যেহেতু আমার আল্লাহ তা'লার প্রতি এবং আমার বিবেকের প্রতি আমার এখলাছ (নিষ্ঠা) ও সততা সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, সেহেতু আল্লাহ তা'লার ওপর আস্থা রেখে এবং তাঁর প্রিয় নবী (দঃ)-এর পবিত্র রূহ মোবারক ও আউলিয়া কেরামের রূহ্ মোবারকের তাওয়াসসুল (মধ্যস্থতা) গ্রহণ করে আমি আমার খেদমত অব্যাহত রেখেছি।

মিশরের জামী আল-আযহার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং একজন মহান হানাফী আলেম শায়খ মোহাম্‌দ বখিত আল-মুতি'য়ী হানাফী তাঁর প্রণীত "তাতহিরুল ফুয়াদ মিন দানিসিল এ'তেকাদ" পুস্তকে লিখেছেন:

"সকলের চেয়ে নবী (আঃ)-গণের রুহ মোবারক হলো উচ্চ মকামের এবং পরিপক্ক। তাঁরা ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, উদাসীনতা, একগুঁয়েমি, নফস বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, হিংসা বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, প্রতিশোধপরায়ণতা ইত্যাদি দোষত্রুটি হতে পবিত্র। নবী (আঃ)-গণ আল্লাহ তা'লা কর্তৃক তাঁদের কাছে প্রকাশিত বিষয়াবলী ব্যাখ্যা ও প্রচার করেছেন। দ্বীন ইসলামের শিক্ষাসমূহ অর্থাৎ নবী (আঃ)-গণের প্রচারিত আদেশ নিষেধসমূহ সবই সত্য। তাঁদের কেউই ভ্রান্তি কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ নন। নবীগণের পরে তাঁদের সাহাবীগণই হলেন সবচাইতে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ও সবচাইতে পরিপক্ক- কেননা তাঁরা নবীগণের সান্নিধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পরিপক্কতাপ্রাপ্ত এবং পরিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত। তাঁরা সব সময়ই নবীগণ হতে যা শুনেছিলেন তাই ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁরা যে সকল বিষয় ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেছিলেন তার সবই সত্য। তাঁরাও উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে পবিত্র। নিজেদের একগুঁয়েমি কিংবা জেদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা একে অপরের বিরোধিতা করেন নি, আর তাঁরা নিজেদের নফসকেও অনুসরণ করেন নি। সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আল্লাহ তা'লার দ্বীনকে তাঁর বান্দাগণের কাছে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে কৃত আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাখ্যাবলী এবং ইজতেহাদসমূহ হচ্ছে নবী করীম (দঃ)-এর উম্মতের ওপর খোদাতা'লার মহান নেয়ামত এবং নূর নবী (দঃ)-এর ওপর বর্ষিত তাঁরই খাস বা বিশেষ দয়া। কুরআনুল করীম ঘোষণা করেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম অবিশ্বাসী কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও সহিষ্ণু; আর তাঁরা নিরলসভাবে নামাজ পড়তেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের কাছ থেকেই সকল জিনিস ও বেহেশত কামনা কিংবা আশা করতেন। তাঁদের সকল ইজতেহাদ যেগুলো সম্পর্কে এজমা (ঐকমত্য) হয়েছিল, সেগুলো সঠিক ছিল। তাঁদের সবাইকেই সওয়াব দেয়া হয়েছিল- যেহেতু বাস্তবতা কেবলমাত্র একটাই।

"সাহাবায়ে কেরামের পরে শ্রেষ্ঠ ইনসান হলেন সেই সকল মুসলমান যাঁরা সাহাবীদেরকে দেখেছেন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। এঁদেরকে 'তাবেউন' বলা হয়। তাবেউনগণ তাঁদের ধর্মীয় জ্ঞান সাহাবীদের কাছ থেকে হাসিল করেছেন। তাবেউনগণের পরে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হলেন তাঁরা যাঁরা তাঁদেরকে দেখেছেন এবং তাঁদের সোহবত বা সাহচর্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন।

এঁদেরকে বলা হয় 'তাবেউত্ তাবেয়ীন'। তাবেউত্ তাবেয়ীনদের পরে কেয়ামত পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আগমণকারী মুসলমানগণের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ হবেন, যাঁরা সলফে সালেহীন তথা এই তিনটি প্রজন্মকে অনুসরণ করবেন এবং তাঁদের শিক্ষাসমূহ ধারণ করে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করবেন। সালাফ আস সালেহীনের পরে আগত ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যাঁর কথা ও কাজ রাসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সালাফ আস সালেহীণের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, আর যিনি তাঁদের পথ হতে কখনোই বিশ্বাসে কিংবা কাজে বিচ্যুত হন না এবং যিনি ইসলামের সীমা লংঘন করেন না, তিনি অন্যদের অপবাদ দেয়ার ও হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতাকে কখনোই ভয় পাবেন না। তাদের বিভ্রান্তির বোড়াজালে তিনি আটক হবেন না। তিনি অজ্ঞদের কথায় কানও দেবেন না। তিনি তাঁর আক্কলকে ব্যবহার করবেন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চার মযহাবের বাইরে যাবেন না। মুসলমানদেরকে একজন জ্ঞানবিশারদের অন্বেষণ করতে হবে এবং তাঁর কাছে তাঁরা যা জানেন না, তা জিজ্ঞেস করে শিক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের দ্বারা সম্পাদিত সকল কাজে ও বিষয়াবলীতে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। কেননা, এই ধরণের জ্ঞানী আলেম-ব্যক্তি আল্লাহ তা'লা কর্তৃক তাঁর বান্দাদেরকে ভুল ভ্রান্তি হতে রক্ষা করার এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট রূহানী বা আধ্যাত্মিক ওষুধ সম্পর্কে নিজেও জানেন এবং মানুষকেও জানিয়ে থাকেন। অর্থাৎ তিনি আত্মার ওষুধ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ও বুদ্ধিহীনদেরকে নিরাময় করবেন। এই আলেম তাঁর সকল কথায়, কাজে এবং বিশ্বাসে ইসলামকে অনুসরণ করবেন। তাঁর উপলব্ধি সব সময়ই সঠিক হবে। তিনি সকল প্রশ্নই সঠিকভাবে উত্তর দেবেন। আল্লাহ তালাও তাঁর সকল কাজকে পছন্দ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রেযামন্দী হাসিলের পথসমূহ অন্বেষণকারীদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন। তিনি ঈমানদারদেরকে এবং জুলুম নিপীড়ন ও বালা মুসীবতে ঈমানের শর্ত পূরণকারীদেরকে রক্ষা করবেন। তিনি তাঁদেরকে নূর (জ্যোতি), পরিত্রাণ ও সুখ শান্তি অর্জন করতে সাহায্য করবেন। তাঁদের কৃত সকল কর্মেই তাঁরা সুখ শান্তি পাবেন। পুনরুত্থান দিবসে তাঁরা আম্বিয়া (আঃ), সিদ্দিকীন (রহঃ), শুহাদা ও সালেহীনগণের সঙ্গে থাকবেন।

"যে কোনো শতাব্দীতেই যদি কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি নবী করীম (দঃ) কিংবা সাহাবায়ে কেরামের আজ্ঞাসমূহ অনুসরণ না করে এবং যদি তার কথা, কাজ ও বিশ্বাস তাঁদের শিক্ষাসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এবং যদি সে নিজের

ধ্যানধারণাকে অনুসরণ করে ও ইসলামের সীমা লংঘন করে, আর যদি সে নিজের উপলব্ধি বহির্ভূত জ্ঞানের ক্ষেত্রে চার মযহাবের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তাকে ধর্মীয় পদে সমাসীন একজন বদমায়েশ ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য করা হবে। আল্লাহ তা'লা তার কলবে (অন্তরে) মোহর মেরে দিয়েছেন। তার চোখ সত্য, সঠিক পথটি দেখতে পাচ্ছে না। তার কানও সঠিক কথাটি শুনতে পাচ্ছে না। আখেরাতে তার জন্যে চরম আযাব (শাস্তি) অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তাকে পছন্দ করবেন না। এ ধরণের লোকেরা নবী (আঃ)-গণেরও শত্রু বটে। তারা মনে করে থাকে যে, তারা সঠিক পথের ওপরই কায়েম আছে। তাই তারা নিজেদের কাজকে পছন্দ করে থাকে। অথচ তারাই হলো শয়তানের অনুসারী। তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই চৈতন্য ফিরে পায় এবং সঠিক পথ অনুসরণ করে। তাদের কথাবার্তা শিষ্ট ও দরকারি এবং আনন্দদায়ক মনে হলেও তাদের চিন্তাধারা ও পছন্দ হলো বদ। তারা আহমক ও উজবকদেরকে ধোকা দিয়ে গোমরাহী এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। তাদের কথাকে তুষারের মত শুভ্র ও নির্মল মনে হলেও সত্যরূপী সূর্যের সামনে ওগুলো গলে যেতে বাধ্য। ধর্মীয় পদে সমাসীন এসব বদমায়েশ লোক যাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ তা'লা মোহর মেরে দিয়েছেন এবং ময়লা বানিয়ে দিয়েছেন তাদেরকে ' আহ্‌ল আল বিদআত' কিংবা 'লা-মাযহাবী বলা হয়। এসব লোকের আকিদা বিশ্বাস ও আমল কুরআনুল করীম, হাদীস শরীফ কিংবা এজমাউল উম্মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সত্য, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা অন্যদেরকেও ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারাও জাহান্নামী হবে। সাহাবীদের সময় এবং তাঁদের পরবর্তীকালে আগত দ্বীনি কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ওই ধরনের গোমরাহ ব্যক্তি বহু ছিল। মুসলমানদের মধ্যে তাদের উপস্থিতি অনেকটা দেহের মধ্যে গ্যাংরিন রোগের উপস্থিতির মতই। যদি এই রোগটি দূর করা না যায়, তাহলে দেহের অন্যান্য অংশও এই বিপর্যয় হতে পরিত্রাণ পায় না। এই সকল গোমরাহ লোকেরা হলো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষদের মতই। তাদের সংস্পর্শে যারা আসবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদেরকে তাদের থেকে দূরে সরে থাকতে হবে, যাতে করে আমরা তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হই"। (শায়খ মোহাম্মদ বখিত আল মুতিয়ী হানাফী কৃত তাতহিরুল ফুয়াদ মিন দানিসিল এ'তেকাদ)।

ধর্মীয় পদে সমাসীন গোমরাহ ও বদমায়েশ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল ইবনে তাইমিয়া। তার লিখিত বই পুস্তকে, বিশেষ করে তার

'আল ওয়াসিতা' পুস্তকে সে এজমা আল মুসলেমীনকে অগ্রাহ্য করেছে, কুরআনুল করীম ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট ঘোষণাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে এবং সলফে সালেহীনগণের পথকে অনুসরণ করেনি। তার ত্রুটিপূর্ণ মস্তিষ্ক ও দুষ্ট চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল সত্য। কিন্তু তার জ্ঞানের কারণেই গোমরাহী তাকে গ্রাস করে। সে তার নিজস্ব চাহিদানুযায়ী চলা শুরু করে। সত্য, সঠিক আদর্শের নামে সে তার মহাভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস পেয়েছিল।

মহান আলেম হযরত ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী আল মক্কী (রহঃ) তাঁর "ফতোয়ায়ে হাদীসিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন :

"আল্লাহ্তা'লা ইবনে তাইমিয়াকে গোমরাহী ও চরম ক্ষতি প্রদান করেন। তিনি তাকে বধির ও অন্ধ বানিয়ে দেন। বহু উলামা জানিয়েছেন যে, তার কাজগুলো ছিল দোষযুক্ত এবং কথাগুলো ছিল মিথ্যা। তাঁরা এটা দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। যাঁরা মহান ইসলামি উলামায়ে কেরাম হযরতুল আল্লামা আবু হাসান তাকিউদ্দীন সুবকী (রহঃ) ও তাঁর পুত্র তাজউদ্দীন সুবকী এবং ইমাম ইযয্ ইবনে জামা'আ-র কেতাবপত্র পড়েছেন এবং যাঁরা ইবনে তাইমিয়ার খন্ডনে তারই সময়কার শাফেয়ী, মালেকী ও হানাফী উলামায়ে কেরামের কথিত এবং লিখিত প্রত্যুত্তরসমূহ অধ্যয়ন করেছেন, তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে আমরাই সঠিক।

"তাসাউফের জ্ঞান বিশারদদের প্রতি ইবনে তাইমিয়া কুৎসা রটনা করে এবং ইবলিসী পন্থায় অপবাদ দেয়। উপরন্তু, সে ইসলামের স্তম্ভ হযরত আলী (কঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-কে আক্রমণ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। তার কথাবার্তা সীমা লংঘন করে ও আদবের খেলাপ হয়ে দাঁড়ায় এবং সে উঁচু পাহাড়ের দিকেও ঢিল ছুঁড়তে শুরু করে দেয়। সে সঠিক পথের মনীষীদেরকে অজ্ঞ মূর্খ ও বেদআতী, গোমরাহ্ হিসেবে হেয় প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়।

"ইবনে তাইমিয়া বলেছে, "ইসলামের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ গ্রীক দার্শনিকদের বিভ্রান্তিকর গোমরাহ ধ্যানধারণা তাসাউফের মহান ব্যক্তিত্বদের বইপত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে।" আর সে এ কথা প্রমাণের জন্যে তার মহাভ্রান্ত চিন্তাধারা দ্বারা উঠে পড়ে লেগেছিল! যেসব যুবক সত্য সম্পর্কে অনবহিত, তারা তার আবেগপূর্ণ ও ধোকাপূর্ণ কথাবার্তায় পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সে বলেছেঃ

'তাসাউফপন্থীগণ বলেন, তাঁরা লওহ্ আল মাহ্ফুজ দেখতে পান। ইবনে

সিনার মত কিছু দার্শনিক এটাকে আন্ নফস্ আল ফালাকিয়্যা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, যখন মানবের রূহ বা আত্মা পূর্ণতা অর্জন করে, তখন আত্মাটি নফস্ আল্ ফালাকিয়্যা কিংবা আল আক্বল আল ফা'য়াল-এর সাথে ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রতাবস্থায় মিলিত হয়; আর যখন কোনো ব্যক্তির রূহ এ দুটোর সাথে মিলিত হয়, যা পৃথিবীতে সকল জিনিস সংঘটিত হবার কারণস্বরূপ, তখন তিনি এগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হতে শুরু করেন। এ সকল কথা গ্রীক দার্শনিকরা বলেনি। এগুলো পরবর্তীকালে আগত ইবনে সীনা ও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের কথা। ইমাম আবু হামিদ আল গাযযালী, সুফী মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী এবং আন্দালুসীয় দার্শনিক কুতুবুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে সাব'ইনও এ ধরণের মন্তব্য করেছেন। এগুলো হলো দার্শনিকদের উক্তি। ইসলামে এসব জিনিসের কোনো অস্তিত্বই নেই। এইসব উক্তি দ্বারা তাঁরা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছেন। তাঁরা শিয়া, ইসমাইলীয়া, কারামতী ও বাতিনী সম্প্রদায়ের মত মূলহিদ (ধর্মচ্যুত) হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আহলে সুন্নতের উলামাবৃন্দ, মুহাদ্দিসগণ ও ফযাইল ইবনে আয়াযের মত তাসাউফের সুন্নী ব্যক্তিত্বদের অনুসৃত সঠিক পথকে পরিহার করেছেন। একদিকে তাঁরা দর্শন শাস্ত্রে ডুব দিয়েছেন, আর অপরদিকে তাঁরা মু'তাযিলা ও কোরামিয়ার মত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাসাউফপন্থীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম শ্রেণীটি হাদীস ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে আছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীটি কোরামিয়া সম্প্রদায়ের মত গোমরাহ্। আর তৃতীয় শ্রেণীটি হলো ইখওয়ান আস সাফা'র বইপত্র এবং আবুল হাইয়্যানের কথার অনুসারী। ইবনুল আরবী ও ইবনে সাব'ইন এবং অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ দার্শনিকদের কথাকে গ্রহণ করে তাসাউফের পণ্ডিতদের মন্তব্যে রূপান্তরিত করেন। ইবনে সিনার 'আখির আল ইশারাত আলা মাকামিল আরেফিন' গ্রন্থটিতে এ ধরণের বহু মন্তব্য আছে। ইমাম আল গাযযালীও তাঁর পুস্তকাদিতে এ ধরণের বহু বক্তব্য রেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর 'আল কেতাবুল মাদনুন' ও 'মেশকাত আল আনওয়ার' পুস্তকে। বস্তুতঃ তাঁর বন্ধু আবু বকর ইবনে আল আরবী তাঁকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন এ কথা বলে যে, তিনি দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু তিনিও ইমাম সাহেবকে বাঁচাতে পারেননি। অপর পক্ষে, ইমাম গাযযালী বলেছেন যে দার্শনিকরা কাফের (অবিশ্বাসী)। তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি সহীহ আল বুখারী (হাদীস গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দরূন তিনি তাঁর পূর্ব লিখিত ধ্যানধারণা বর্জন করেছিলেন। আর কেউ কেউ

বলেছেন যে, ইমাম গাযযালীকে হেয় করার জন্যে ওই সকল বক্তব্য তাঁর নামে আরোপ করা হয়েছিল! ইমাম গাযযালীর ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। মালেকী আলেম মোহাম্মদ মাযারী যিনি সিসিলিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং আন্দালুসীয় পণ্ডিত তরতুসী এবং ইবনুল জাওযী ও ইবনে উক্কাইল এবং অন্যান্যরা এ রকম বহু মন্তব্য করেছেন।' (ইবনে তাইমিয়ার উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো)।

"ইবনে তাইমিয়া হতে উদ্ধৃত তার উপরোক্ত ধারণাসমূহ সুস্পষ্টভাবে আহলে সুন্নতের উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে তার বদ চিন্তাই প্রতিভাত করে। এমনকি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনদের প্রতিও সে এরকম অপবাদ দিয়েছে। সে আহলে সুন্নতের অধিকাংশ উলামাকে গোমরাহ পথভ্রষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইত্যবসরে সে যখন মহান ওলী ও কুতুবুল আরেফীন হযরত আবুল হাসান শাযিলীকে তাঁর 'হিযবুল কবীর' ও হিযবুল বখর' গ্রন্থ দুটোর জন্যে গালাগালি করছিল এবং মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী, উমর ইবনে ফরিদ ও হাল্লাজ হুসেইন ইবনে মনসুরের মত মহান সুফীদেরকে অপবাদ দিচ্ছিল, তখন তার সময়কার উলামাবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে ফতোওয়া জারি করেন যে, সে একজন গুনাহগার ও গোমরাহ ব্যক্তি।

"৭০৫ হিজরীতে ইবনে তাইমিয়াকে লিখিত একটি চিঠি ঘোষণা করেঃ 'হে আমার মুসলিম ভ্রাতা, যে নাকি নিজেকে একজন বড় আলেম ও সময়ের ইমাম মনে করছ। আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবেসেছিলাম। তোমার বিরুদ্ধাচরণকারী উলামাদেরকে আমি স্বীকৃতি দিতাম না। কিন্তু তোমার প্রতি ভালবাসার পরিপন্থী তোমার কিছু কথা আমাকে বিস্মিত করেছে। সূর্যাস্তের পরে যে রাত শুরু হয়, তা কি কোনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ করেন ? তুমি বলেছিলে যে, তুমি সঠিক পথের পথিক এবং আল আমরু বিল মা'রূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা) পালন করছ। আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন তোমার প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (নিয়্যত) কী। তবে মানুষের এখলাস তথা নিষ্ঠা তার কর্ম দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। তোমার কর্ম তোমার মিষ্টি কথার পর্দাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। যারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি (নফসানীয়াত)-কে অনুসরণ করে এবং যাদের কথা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদের দ্বারা ধোকাপ্রাপ্ত হয়ে তুমি কেবলমাত্র তোমার সময়ে জীবিতদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করনি, বেসাল প্রাপ্তদেরকেও কুফরীর অপবাদ দিয়েছ। সালাফ আস সালেহীনের উত্তরসূরীদেরকে আক্রমণ করে তৃপ্তি না পেয়ে তুমি সাহাবায়ে কেরাম, বিশেষ

করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জনদেরকেও গালমন্দ করতে কুণ্ঠিত হওনি। তুমি ধারণা করতে পার তোমার কী অবস্থা হবে যখন ওই সকল মহান ব্যক্তিত্ব পুনরুত্থান দিবসে তাঁদের হক তথা অধিকার দাবি করবেন ? সালেহীয়্যা নগরীতে জামে আল জাবাল মসজিদের মিম্বরে তুমি বলেছ যে, হযরত ওমর (রাঃ)- এর কিছু ভুল মন্তব্য এবং কিছু গুনাহ্ খাতা আছে। গুনাহ্ খাতাগুলো কী ছিল ? সালাফ আস সালেহীন কর্তৃক কোন্ কোন্ গুনাহ-খাতা তোমার কাছে বর্ণিত হয়েছে তা জানতে পারি কি ? তুমি বলেছ যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর নাকি তিন শতাধিক ভুল ভ্রান্তি হয়েছিল। যদি ধরা হয় যে, হযরত আলী (কঃ)-এর ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল, তাহলে কি তোমার ক্ষেত্রে একটিও সঠিক হবে? এখন আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করব। আমি মুসলমানদেরকে তোমার বদমায়েশী থেকে রক্ষা করতে তৎপর হবো। কেননা, তুমি সীমা লংঘন করেছ। তোমার যুলুম-অত্যাচার জীবিত ও বেসাল প্রাপ্তদেরকে স্পর্শ করেছে। মু'মিনদেরকে তোমার শয়তানী হতে দূরে সরে থাকতে হবে।'

(ইবনে তাইমিয়াকে লেখা চিঠির উদ্ধৃতি শেষ হলো)।

"সালাফ আস্ সালেহীনের সাথে ইবনে তাইমিয়া যেসব বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলো আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী তালিকাভুক্ত করেছেন। তালিকা নিম্নরূপ:

১। সে বলেছে, তালাক (ইসলামী পন্থায়) প্রকৃত হয় না, (যদি কোনোক্রমে হয়ে যায়) শপথের জন্যে কাফফারা দেয়া অবশ্য কর্তব্য। ইবনে তাইময়ার পূর্বে আগত কোনো ইসলামি আলেমই বলেননি যে, কাফফারা দিতে হবে।

২। সে বলেছে, হায়েজ (ঋতু শ্রাব) সম্পন্ন নারীকে প্রদত্ত তালাক প্রকৃত হয় না, তার পবিত্রতার সময় প্রদত্ত তালাকও প্রকৃত হয় না।

৩। সে আরো বলেছে, 'ইচ্ছাকৃতভাবে তরককৃত নামাযের কাযা (পূরণ) পড়া অপরিহার্য নয়।

৪। তার মন্তব্য, 'হায়েয সম্পন্ন নারীর জন্যে কাবা শরীফের তাওয়াফ করা মোবাহ (অনুমতিপ্রাপ্ত)। সে যদি তা করে, তবে তাকে কাফফারা দিতে হবে না।'

৫। ইবনে তাইমিয়া বলেছে, 'তিন তালাকের নামে প্রদত্ত এক তালাক এক তালাকই থাকবে।' অথচ এ কথা বলার আগে সে বহুবার বলেছে যে এজমা আল মুসলিমিন এ রকম নয়।'

৬। সে বলেছে, 'ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কর ট্যাক্স তাদের জন্যে হালাল যারা তা দাবি করে'।

৭। ইবনে তাইমিয়ার অভিমত হলো, 'যখন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কর

আদায় করা হয়, তখন তা যাকাত হয়ে যায়, যদিও তা যাকাতের নিয়্যতে দেয়া না হয়'।

৮। সে বলেছে, 'একটি ইঁদুর কিংবা একটি বিড়াল যদি (হাউজের) পানিতে মরে পড়ে থাকে তাতেও পানি নাজস্ বা অপবিত্র হবে না'।

৯। সে আরো বলেছে, 'জুনুব বা স্ত্রী সহবাসের পর নাপাক ব্যক্তি রাতের গোসল ছাড়াই নফল নামায পড়তে পারবে। এটা অনুমতিপ্রাপ্ত'।

১০। সে বলেছে, 'ওয়াকিফ তথা ওয়াক্ফ প্রদানকারী ব্যক্তির আরোপিত শর্তাবলী অবিবেচনাযোগ্য। যা শাফেয়ীদের জন্যে উৎসর্গিত তা হানাফীদের জন্যে খরচ করা হয়'।

১১। সে বলেছে, 'যে ব্যক্তি এজমা আল উম্মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, সে অবিশ্বাসী (কাফের) কিংবা পাপী (ফাসিক) হয় না'।

১২। ইবনে তাইমিয়া মত প্রকাশ করেছে, 'আল্লাহ্ তা'লা হলেন মহল্ল-ই-হাওয়াদিস (সৃষ্টির উৎপত্তিস্থল) এবং তিনি সমাবিষ্ট অণুর দ্বারা তৈরি'।

১৩। সে আরো বলেছে, 'কুরআনুল করীম আল্লাহ পাকের যাত বা সত্তার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে'।

১৪। সে বলেছে, আলম তথা সৃষ্টি জগত তার প্রজাতি নিয়ে চিরন্তন থাকবে'।

১৫। ইবনে তাইমিয়ার ধারণা হলো, 'আল্লাহ্ তা'লাকে ভাল জিনিস সৃষ্টি করতে হয়'।

১৬। সে বলেছে, 'আল্লাহ পাকের দেহ ও দিক আছে; তিনি তাঁর স্থান পরিবর্তন করেন এবং তিনি আরশের মতই বড়'।

১৭। সে বলেছে, 'জাহান্নাম চিরস্থায়ী নয়। এটাও বিলীন হয়ে যাবে'।

১৮। ইবনে তাইমিয়া নবী (আঃ)-গণের ত্রুটি বিচ্যুতিহীনতার প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

১৯। সে বলেছে, 'রাসুলূল্লাহ (দঃ) অন্যান্য সাধারণ মানুষ হতে ভিন্ন কিছু নন। তাঁর মধ্যস্থতায় দোয়া করা অনুমতিপ্রাপ্ত নয়'।

২০। ইবনে তাইমিয়া মত প্রকাশ করেছে, রাসুলুল্লাহ (দঃ)-কে যেয়ারত করার নিয়্যতে মদীনা শরীফ যাওয়া পাপ'।

২১। সে বলেছে, 'মহানবীর রওযায়ে আক্দসে শাফায়াত প্রার্থনা করতে যাওয়া হারাম'।

২২। সে আরো বলেছে, তওরাত ও ইনজিল শব্দসম্ভারে পরিবর্তিত হয় নি, বরং অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে।

"কিছু ওলামা বলেছেন যে, উপরোক্ত মন্তব্যগুলো অধিকাংশ ইবনে তাইমিয়ার

ছিলা না, কিন্তু 'খোদা তা'লার দিক আছে এবং তিনি সমাবিষ্ট অণুর দ্বারা তৈরি' মর্মে ইবনে তাইমিয়ার মন্তব্যকে কেউই অস্বীকার করেন নি। তবে সে যে এলম-এ সমৃদ্ধ ছিল, তা সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছিল। যে ব্যক্তির ফেকাহ, জ্ঞান, ইনসাফ ও বিচার বুদ্ধি আছে, তার উচিৎ প্রথমে কোনো বিষয়কে পর্যবেক্ষণ করা এবং তারপর বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। বিশেষ করে কোনো মুসলমানের কুফরী কিংবা ধর্মচ্যুতি অথবা তাঁকে হত্যা করার বিষয়টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের এবং সতর্ক দৃষ্টির দাবি রাখে"। (ইমাম ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী কৃত ফতোয়ায়ে হাদিসিয়ার উদ্ধৃতি এখানে সমাপ্ত হলো)

সম্প্রতি ইবনে তাইমিয়াকে অনুসরণ করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। গোমরাহ্ লোকেরা তার গোমরাহ্ লেখনীকে বিশেষ করে তার আল ওয়াসিতা পুস্তককে সমর্থন করছে এবং সেগুলোকে পুর্নমূদ্রণ করছে। আল ওয়াসিতা পুস্তকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআনুল করীম, হাদীস শরীফ ও এজমা আল মুসলিমিনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধ্যানধারণায় পরিপূর্ণ। পাঠকদের মধ্যে এটা বিরাট ফিতনা ও বিভক্তি সৃষ্টি করে এবং মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে বৈরিতার জন্ম দেয়। সৌদী নজদী ওহাবীরা এবং তাদের ফাঁদে পতিত অন্যান্য মুসলিম দেশের ধর্মীয় পদে সমাসীন অজ্ঞ ওহাবী-মওদূদীপন্থী লোকেরা ইবনে তাইমিয়াকে নিজেদের জন্যে ব্যানার বানিয়ে নিয়েছে। তারা তাকে "মহান মুজতাহিদ" ও "শায়খুল ইসলাম" ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করছে। তারা তার গোমরাহ্ চিন্তাধারা ও নীতিভ্রষ্ট লেখনীকে ঈমান এবং আকিদা বিশ্বাসের নামে আঁকড়ে ধরছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ও ইসলামের মধ্যে অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারী এ ভয়াবহ ধারাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে আমাদেরকে এর দলিলভিত্তিক খণ্ডনকারী সুন্নী উলামাগণের মহামূল্যবান বইপত্র পাঠ করতে হবে। তাঁদের এ সকল লেখনীর মধ্যে মহান ইমাম ও গভীর জ্ঞানী আলেম হযরতুল আল্লামা তাকিউদ্দীন সুবকী রচিত "আশ শিফাউস্ সিকাম ফি যেয়ারতী খাইরিল্ আনাম" নামক আরবী গ্রন্থটি ইবনে তাইমিয়ার গোমরাহ্ ধ্যানধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করেছে, তার ফিতনাকে দমন করেছে এবং তার একগুঁয়েমি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছে। এটা ইবনে তাইমিয়ার বদ উদ্দেশ্য ও মহাভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসার রহিত করেছে। এই মহামূল্যবান বইটি সম্প্রতি হাকিকাত কিতাবেভী (ইস্তাম্বুল) হতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(সমাপ্ত)